



আমাদের মহাভারত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পা

গুবদের বনবাসের চার বছর কেটে গিয়েছে। এখনও আরও একটা বছর বাকি, তারপরেও আর একটা বছর থাকতে হবে অজ্ঞাতবাসে। তার মানে, এমন ভাবে লুকিয়ে থাকতে হবে, যাতে কেউ চিনতে না পারে।

বনের মধ্যে পাগুবদের সময় কাটে কী করে? গুঁদের সঙ্গে মুনি-ঋষিদের একটা দলবল আছে। সন্দের সময় সবাই এক জায়গায় বসে গল্প শুরু হয়। মুনি-ঋষিরা অনেক গল্প জানেন, সেসব গল্প দারুণ আকর্ষক। তার এক-একটা গল্প নিয়ে পরে আলাদা-আলাদা বই কিংবা নাটক লেখা হয়েছে। আমরা পরে সেই গল্পগুলো পড়ে নেব। তার মধ্যে অন্তত দু'টি গল্প না বললেই নয়।

একটা হচ্ছে, অগস্ত্য ঋষির কাহিনি। তিনি এক মহাঋষি, অসাধারণ তাঁর ক্ষমতা। তাঁর জীবনের কয়েকটা ঘটনা শুনলেই তা বোঝা যাবে।

এক দেশে ইন্ড্রল নামে এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন, তিনি নানারকম জাদুবিদ্যা জানতেন। কারও উপর রাগ হলে তিনি অদ্ভুত ভাবে প্রতিশোধ নিতেন। একবার এক ব্রাহ্মণ তাঁর একটা অনুরোধ রক্ষা করেননি বলে ইন্ড্রল খুবই রেগে গেলেন, কিন্তু বাইরে রাগ না দেখিয়ে বরং খাতির করে



সেই ব্রাহ্মণকে নেমন্তন্ন করলেন রাজপ্রাসাদে। ইন্ডলের এক ভাই ছিল, তার নাম বাতাপি। ইন্ডল মন্ত্রবলে তাঁর ভাইকে একটা ভেড়া বানিয়ে ফেললেন, তারপর তাকে কেটেকুটে সেই মাংস রান্না করে খাইয়ে দিল ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ কোনও সন্দেহ না করে সেই মাংস যেই খেয়ে ফেললেন, ইন্ডল অমনি দু'বার ডাকলেন, “বাতাপি, বাতাপি।” অমনি তাঁর ভাই ব্রাহ্মণের পেট ছিন্নভিন্ন করে মানুষের মতো বাইরে বেরিয়ে এসে হাসতে লাগল।

এইভাবে ইন্ডল অনেককে হত্যা করেছেন।

একদিন অগস্ত্য এলেন ইন্ডলের রাজপুরীতে। ইন্ডল তাঁকে খাতির করে চুপি-চুপি তাঁর ভাইকে ভেড়া বানিয়ে সেই মাংস খেতে দিলেন অগস্ত্যকে। তারপর ডাকতে লাগলেন, “বাতাপি, বাতাপি!” কোনও সাড়া নেই। আবার তিনি ডাকলেন, “আয় তো ভাই বাতাপি।”

অগস্ত্য মেঘের গর্জনের মতো একটা ঢেকুর তুলে সহাস্যে বললেন, “যতই ডাকো, কোনও লাভ নেই! আমি তাকে হজম করে ফেলেছি।”

তখন ইন্ডল ক্ষমা চেয়ে অগস্ত্যকে একটা সোনা-বাঁধানো রথ আর দু'টি সুন্দর ঘোড়া উপহার দিলেন।

আর একবার দেবতারা দল বেঁধে এলেন অগস্ত্যের কাছে সাহায্য চাইতে। তখন দেবতা ও দৈত্যের মধ্যে প্রায়ই লড়াই বাধত। দৈত্যরা দিনেরবেলায় সমুদ্রের নীচে লুকিয়ে থাকে, রাতেরবেলা উঠে এসে সবাইকে মারতে শুরু করে, তাই ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যায় না। দেবতারা অগস্ত্যকে বললেন, “আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। দেবতাদের অনুরোধ শুনে অগস্ত্য এসে দাঁড়ালেন সমুদ্রতীরে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে, দু'হাত জুড়ে জলপান করতে লাগলেন। তিনি চোঁ-চোঁ করে জল টেনে যাচ্ছেন তো টেনেই যাচ্ছেন, থামছেন না। এক সময় পুরো সমুদ্রের জল শেষ হয়ে গেল, তখন দেখা গেল অসংখ্য মাছ, জলের প্রাণীদের মধ্যে বসে আছে দৈত্যদের দলবল। তখন যুদ্ধে অনেক দৈত্যদানব নিহত হল, কিছু-কিছু পালিয়েও গেল।

মধ্য ভারতে বিষ্ণু নামে একটা পর্বত আছে, এক সময় সে খুব অহংকারী হয়ে উঠল। একদিন সে সূর্যকে ডেকে বলল, “তুমি আমার মাথার উপর দিয়ে যেতে পারবে না, মেরু পর্বতের পাশ দিয়ে যেমন ঘুরে যাও, সেইরকম আমারও পাশ দিয়ে ঘুরে যাবে।

সূর্য বললেন, “আমি তো ইচ্ছেমতন কোনও পর্বতকে প্রদক্ষিণ করি না। এই বিশ্বের যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর

নিয়মেই আমি যাই।”

এতে সন্তুষ্ট না হয়ে বিদ্য পর্বত উঁচু হতে শুরু করল। এক সময় তার চুড়ো ঠেকে গেল আকাশে। চাঁদ বা সূর্য আর তার মাথার উপর দিয়ে যেতে পারে না।

এতে তো জগৎ একেবারে অন্ধকারে ডুবে যাবে। দেবতারা আবার দৌড়ে এলেন অগস্ত্যের কাছে। অগস্ত্য তখন তাঁর স্ত্রী লোপামুদ্রাকে নিয়ে এলেন বিদ্য পর্বতের কাছে। মহাঋষি অগস্ত্যের তখন এমন প্রতাপ ও নামডাক যে, এমনকী পাহাড়ও তাঁকে ভয় পায়। বিদ্য পর্বত মাথা নিচু করে তাঁকে প্রণাম জানাল। অগস্ত্য তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, “আমি এখন দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি, তুমি পথ ছেড়ে দাও। তারপর আমি ফিরে এলে তুমি আবার উঁচু হোয়ো, যত তোমার ইচ্ছে!”

অগস্ত্য সে পথ দিয়ে আর কোনওদিনই ফিরে আসেননি, বিদ্য পর্বতেরও অহংকার চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেইজন্য, এখনও কেউ যদি কোথাও যাত্রা করে আর ফিরে না আসে, তাকে বলে ‘অগস্ত্যযাত্রা’।

এবার পরশুরামের কথা। এই পরশুরাম মহাভারতের কাহিনিতে মাঝে-মাঝেই দেখা দিয়েছেন, আবার রামায়ণেও তিনি আছেন। ইনি যে অমর।

একসময় জমদগ্নি নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম রেণুকা, তাঁদের পাঁচটি ছেলে, সবচেয়ে ছোটটির নাম পরশুরাম। একদিন রেণুকা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অন্যান্য লোকজন দেখে তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড়েই ফিরে এলেন আশ্রমে। তা দেখে রেণুকা গেলেন জমদগ্নি, অন্য লোকজনদের সামনে দিয়ে ভিজে কাপড়ে আসা উচিত হয়নি বলে বকাবকি করতে লাগলেন স্ত্রীকে। রেণুকা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতেই ঝগড়া লেগে গেল। ক্রমে জমদগ্নি এমনই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন যে, নিজের বড় ছেলেকে বললেন, “তোমার মায়ের মুণ্ডুটা কেটে ফ্যালো তো!”

সেকালে পিতার আদেশ কোনও পুত্রই অগ্রাহ্য করতে পারত না। বাবা যত অন্যায় আদেশই করুন না কেন। যেমন, রামায়ণে রাজা দশরথ অন্যায় ভাবেই তো বিনা দোষে রামকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। রাম কিন্তু একটুও গজগজ পর্যন্ত করেননি। কিন্তু বাবার হুকুমেও কি মাকে মেরে ফেলা যায়? বড় ছেলেটি বলল, “আমি পারব না।”

আর জমদগ্নি পরপর তাঁর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তানকে এই একই আদেশ করলেন। তারা কেউ মাতৃহত্যা করতে রাজি নয়। জমদগ্নি রেগেমেগে চার ছেলেকে অভিশাপ দিলেন, “তোদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাক, তোরা বোকা-হাভা হয়ে থাক।”

এই সময় আশ্রমে ফিরে এল ছোট ছেলে। জমদগ্নি তাকে

বললেন, “আমার আদেশ, তুমি তোমার মাকে হত্যা করো!”

পরশুরাম একটুও দ্বিধা না করে পিতৃআজ্ঞায় একটা খড়্গ নিয়ে ঘচাং করে কেটে ফেলল মায়ের মুণ্ড।

এতক্ষণে জমদগ্নির ক্রোধ কমল। ছোট ছেলেকে বললেন, “বৎস, আমি তোমার উপর খুশি হয়েছি, তুমি বর চাও!”

পরশুরাম বললেন, “আমার মা এফুনি বেঁচে উঠুক। আর এই বীভৎস কাণ্ডের কোনও স্মৃতিই যেন আমার না থাকে। আর এতে যেন আমার কোনও পাপ না হয়।”

বাবা বললেন, “তথাস্তু! আর?”

পরশুরাম বললেন, “আমার চার ভাই আবার স্বাভাবিক মানুষের মতো হয়ে উঠুক।”

জমদগ্নি বললেন, “তথাস্তু, আর?”

পরশুরাম বললেন, “আমি যেন যুদ্ধবিদ্যায় সবার চেয়ে সেরা হই, আর আমার আয়ু যেন বহুদিন বেড়ে যায়।”

জমদগ্নি সে বরও দিলেন প্রিয় পুত্রকে। আশ্রমে আবার শান্তি ফিরে এল।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ সেখানে আবার একটি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটল।

কার্তবীৰ্য নামে ছিলেন এক অত্যাচারী রাজা। তিনি এত দ্রুত অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারতেন যে, লোকে বলে তাঁর নাকি এক হাজারটা হাত। তাঁর ছেলেরাও খুব ডাকাবুকো। তারা লোকদের মারধর আর লুণ্ঠপাট করে বেড়াত। তাদের জ্বালায় দেবতা ও ঋষিরাও অতিষ্ঠ। একদিন হঠাৎ কার্তবীৰ্য, যাঁর পুরো কার্তবীৰ্যার্জুন, চলে এলেন জমদগ্নি মূনির আশ্রমে। সেখানে দেখলেন গাছে-গাছে নানান রকম সুস্বাদু ফল ফলে আছে, আর আছে অনেক ভাল-ভাল গোরু। কার্তবীৰ্য আর তাঁর সৈন্যরা সব গাছের ফল ছিঁড়ে গাছগুলো ভেঙে লুণ্ঠভণ্ড করে, গোরুগুলোকেও হরণ করে নিয়ে চলে গেল। খানিক পরে পরশুরাম আশ্রমে ফিরে সেই অবস্থা দেখলেন আর বাবার মুখে সব শুনলেন। তক্ষুনি তিনি জোরে ছুটে গেলেন সেই অত্যাচারী রাজার খোঁজে। বেশি দূর যেতে পারেননি, কার্তবীৰ্যকে পেয়েও গেলেন পরশুরাম। সম্মুখ যুদ্ধে আগে তিনি কার্তবীৰ্যের হাত কেটে ফেললেন, তারপর এক ভল্লের আঘাতে কেটে ফেললেন মাথা। তারপর পরশুরামের রাগ মিটল।

কিন্তু সব মিটল না। আবার একদিন, আশ্রমে ছেলেরা কেউ নেই, জমদগ্নি ঋষি একা বসে তপস্যা করছেন, এমন সময় এসে পড়ল কার্তবীৰ্যের ছেলেরা। তারা মারতে শুরু করল বৃদ্ধ ঋষিকে। তিনি অসহায় ভাবে, ‘রাম, পরশুরাম’ বলে ডাকতে লাগলেন, একটুক্ষণের মধ্যেই খুন হয়ে গেলেন।

পরশুরাম ফিরে এসে দেখতে পেলেন নিহত পিতাকে।

আশ্রমের দু’-একজনের মুখে শুনলেন কার্তবীর্যের ছেলেদের কথা। পরশুরাম একাই গেলেন তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এমনিতেই তিনি মহাবীর, তার উপর বর পেয়েছেন বাবার কাছ থেকে, যুদ্ধে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। কার্তবীর্যের সব ক’টি ছেলে আর সৈন্যসামন্ত তিনি ধ্বংস করে ফেললেন। তারপরে রাগে পরশুরামের শরীর জ্বলছে। রাগ হল সমস্ত রাজারাজড়া আর ক্ষত্রিয় জাতির উপর। এরপর তিনি সমস্ত ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করতে লাগলেন। এক সময় পৃথিবীতে আর একজনও ক্ষত্রিয় রইল না। এইভাবে নাকি পরশুরাম একুশবার পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয়দের নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিলেন, শুধু তাঁদের রক্তেই ভর্তি হয়ে গিয়েছিল পাঁচটা হৃদ।

একসময় মুনি-ঋষিরা এসে বললেন, “পরশুরাম, থামো থামো! আর হিংসা কোরো না। ক্ষত্রিয়দের ক্ষমা করে দাও।”

পরশুরাম তখন হাতের রক্তাক্ত কুঠারটা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে যজ্ঞ করতে বসলেন। পৃথিবীতে তখন আর কোনও রাজা নেই, পরশুরাম সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর। তিনি তখন কশ্যপ নামে এক পরম শ্রদ্ধেয় মুনিকে গোটা পৃথিবীটা দান করে দিয়ে চলে গেলেন মহেন্দ্র পর্বতে। সেখানেই তিনি সব সময় থাকেন।

এই পরশুরাম এক সময় কর্ণকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন। অনেক দুর্দান্ত অস্ত্র প্রয়োগের শিক্ষা তিনি কর্ণকে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ভুল বুঝে তিনি কর্ণকে একটা চরম অভিশাপও দিয়েছিলেন। সে কথা আমরা যথাসময়ে শুনব।

পাণ্ডবরা খুব বেশিদিন এক বনে থাকেন না। ঘুরে-ঘুরে বেড়ান, অনেক তীর্থস্থানেও যান। অর্জুন চলে গিয়েছেন অস্ত্রশিক্ষা করতে দূর বিদেশে, তাঁর কথা সবারই মনে পড়ে। মাঝে-মাঝে দস্যুদানবরা ওঁদের আক্রমণ করতে আসে, তখন ভীম একাই সব সামলে দেন। ভীম কোনও কারণে দূরে গেলে তাঁর ছেলে ঘটোৎকচ সাহায্য করতে আসে।

পঞ্চম বছরে ফিরে এলেন অর্জুন। তাঁরও কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে এর মধ্যে। অস্ত্রের সন্ধানে তিনি কত জায়গায় গিয়েছেন, এমনকী, একবার মহাদেবের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছে। কিছুদিনের জন্য গিয়েছিলেন স্বর্গে। তখনকার দিনে কিছু মানুষ জ্যোন্ত অবস্থাতেও যেতেন স্বর্গে, আবার ফিরেও আসতেন। স্বর্গ বোধ হয় কাছাকাছিই কোথাও ছিল।

নানান অরণ্যে ভ্রমণ করতে-করতে এক জায়গায় পাণ্ডবদের এক দারুণ বিপদের সম্মুখীন হতে হল। একদিন এমন একটা জায়গায় পৌঁছলেন, যেখানে কোনও নদী নেই, হ্রদ নেই। জল ছাড়া তো মানুষ বাঁচতে পারে না, পাণ্ডবরা সবাই খুব তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে নকুল একটা বটগাছে চড়ে দেখতে লাগলেন, দূরে কোথাও জলাশয় আছে কিনা। জল দেখা যাচ্ছে না, তবে একদিকে কিছু সারস উড়ছে দেখে মনে হল, ওখানে জল থাকতেও পারে।

যুধিষ্ঠির বললেন, “তুমি পাত্র নিয়ে সেদিকে যাও, জল নিয়ে এসো।”

নকুল খুঁজতে-খুঁজতে অনেকটা দূর গিয়ে একটা দিঘি দেখতে পেলেন। আগে নিজে একটু জল পান করে নেবেন ভেবে নকুল যেই সেই জলে হাত ডোবাতে গিয়েছেন, অমনি অদৃশ্য ভাবে কে যেন বলল, “ওহে বৎস, এই জলাশয় আমার। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর জল খাও।”

নকুল এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন ‘ধূত’ বলে যেই জল খেতে গিয়েছেন অমনি তাঁর মৃত্যু হল।

নকুল আসছেন না, আসছেনই না। সকলে তৃষ্ণার্ত হয়ে ছটফট করতে লাগলেন।

অভিযান-এর বই



আনন্দবাজারে
বেস্টসেলার

আমার বাবা

বাবা বিষয়ক একটি চিঠি-কবিতা-গল্প-
স্মৃতিকথা-ছবির কিশোর সংকলন। ২০০



আনন্দবাজারে
বেস্টসেলার

আমার মা

মা বিষয়ক একটি চিঠি-কবিতা-গল্প-
উপন্যাস-ছবির কিশোর সংকলন। ১৫০

শিক্ষকদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে আমার শিক্ষক

১০ আগস্ট থেকে বইয়ের
দোকানে পাওয়া যাবে

উলুক ঝুলুক ছড়ার মূলুক
ভ্রানীপ্রসাদ মজুমদার
ছড়া সংকলন ৪০



ডাকাত বনাম ডাকু
বিভূতিভূষণ মণ্ডল ২৫
অ্যাডভেঞ্চার গল্প সংকলন

যত কাণ্ড পাখি নিয়ে
আবীর গুপ্ত ৩৫

দেশ বিদেশের নানান পাখি বিষয়ক
ছোটদের সংকলন



শ্রেষ্ঠ ছড়া
শ্যামলকান্তি দাশ ৭০
বাংলা অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত
ছড়া সংকলন



অভিযান পাবলিশার্স
৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
+৯১ ৮০১৭০৯০৬৫৫

email: abhijan_publishers@rediffmail.com
Abhijan Publishers on Facebook:
www.facebook.com/abhijanpublishers

যুধিষ্ঠির সহদেবকে বললেন, “তুমি যাও তো, দ্যাখো, নকুলের কী হল, আর জলও নিয়ে এসো।”

সহদেব সেই জলাশয়ে গিয়ে এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন এবং তা অগ্রাহ্য করে জল ছুঁতে গিয়েই প্রাণ হারালেন। এরপর একে-একে অর্জুন ও ভীমও গেলেন, তাঁরাও আর ফিরলেন না।

এর পর যুধিষ্ঠিরকে যেতেই হল। বনবাসী হয়েও তিনি তো রাজা, এত সাধারণ কাজে তাঁর যাবার কথা নয়। কিন্তু তেঁষ্টায় দ্রৌপদী আর সবাই ছটফট করছেন, তাই তাঁকে যেতেই হল।

যুধিষ্ঠির সেই জলাশয়ের কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁর চার ভাই সেখানে মরে পড়ে রয়েছেন। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড, যুদ্ধের কোনও চিহ্ন নেই, তবু এই চারজন কী করে মৃত্যু বরণ করলেন? যুধিষ্ঠির অব্যোরে কাঁদতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই দুর্যোধন কিংবা শকুনি কোনওরকম গুপ্ত কৌশলে এঁদের হত্যা করিয়েছেন।

কিন্তু তৃষ্ণা এমনই প্রবল যে, সবারকম শোকও একপাশে সরিয়ে দেয়। যুধিষ্ঠির কান্না থামিয়ে সেই সরোবরে নেমে জল পান করতে গেলেন। তখন তিনিও তাঁর ভাইদের মতো শূন্য থেকে এক কণ্ঠস্বর শুনলেন, “সাবধান, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তুমি যদি জল খাও, তা হলে তোমারও ভাইদের মতো দশা হবে।”

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কে?”

উত্তর শোনা গেল, “আমি বক।”

যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে বললেন, “বক? আমার ভাইরা মহাবীর, তাদের একসঙ্গে হত্যা করতে পারে, এমন শক্তিশালী কে আছে? আপনার সত্যি পরিচয় বলুন।”

তখন আবার উত্তর এল, “আমি যক্ষ!”

তারপর দেখা গেল তালগাছের মতো লম্বা, সারা গা থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে, এরকম একজন পুরুষকে। বজ্রের মতো গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, “রাজা, আমি অনেকবার নিষেধ করেছি, তোমার ভাইরা শোনেনি। তুমিও যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দাও...”

যুধিষ্ঠির বললেন, “ঠিক আছে, তুমি প্রশ্ন করো, আমি যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করব।”

এর পর যক্ষ পর-পর ন’টা প্রশ্ন করেছিলেন, খুব শক্ত-শক্ত প্রশ্ন, তবু যুধিষ্ঠির সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন। সেসব আমাদের না জানলেও চলবে। শুধু একটা প্রশ্ন আমরা বুঝে নিতে পারি। মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় লেখা, আমরা তো সেই ভাষা বুঝি না, তবু একটুখানি স্বাদ নেওয়া যাক।

যক্ষের একটা প্রশ্ন ছিল, “সুখী কে?”

তার উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন:

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ

অনুনী চাপ্রবাসে চ স বারিচর মোদতে॥

দিবসাস্যাষ্টমে মানে হল, দিনের অষ্টম ভাগে, অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা। শাকং পচতি যো নরঃ, মানে, যে মানুষ শাক রান্না করে। পরের লাইনের মানে, যার কোনও ঋণ নেই, আর যে বিদেশে থাকে না, তাকেই সুখী বলা যায়। অর্থাৎ, যে মানুষের কোনও ধারটার নেই, যে নিজের দেশে থেকে শুধু সন্ধ্যাবেলা খানিকটা শাক রন্ধে খায়, সেই আসলে সুখী।

যুধিষ্ঠিরের সব ঠিকঠাক উত্তর শুনে খুশি হয়ে যক্ষ বললেন, “বেশ! বলো, তোমার ভাইদের কোন একজনকে তুমি বাঁচাতে চাও!”

যুধিষ্ঠির বললেন, “নকুলকে বাঁচিয়ে দিন।”

এটা শুনে খুব অবাক হয়ে যক্ষ বললেন, “সে কী! ভীম তোমার সবচেয়ে প্রিয় ভাই, তা আমি জানি। আর অর্জুন তোমাদের বল-ভরসা। এদের বাদ দিয়ে তোমার সৎ ভাই নকুলকে বাঁচাতে চাইছ কেন?”

যুধিষ্ঠির বললেন, “আমি কখনও অধর্মের কাজ করতে পারি না। কুন্তী আর মাদ্রী আমাদের দুই মা। এই দুই মায়েরই অন্তত একটি করে সন্তান বেঁচে থাকুক, আমি তাই চাই!”

এবারে যক্ষ বললেন, “বৎস, আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। আমিই ধর্ম, তোমার পিতা। তোমার চার ভাই-ই বেঁচে থাকবে। তোমাদের বনবাসের বারো বছর তো পূর্ণ হয়ে এল। এর পর এক বছর তোমাদের অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমরা এই এক বছর ইচ্ছে মতো ছদ্মবেশে থাকতে পারবে।

পাঁচ ভাই আশ্রমে ফিরে এসে ঋষি ও পুরোহিতদের প্রণাম করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, “এখন এক বছর আমাদের আত্মগোপন করে থাকতে হবে। তাই আপনাদের কাছে বিদায় নিতে চাইছি।”

ঋষিরাও তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, “আবার নিশ্চয়ই আমাদের দেখা হবে।”

এর পর পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী এক জায়গায় এসে পরামর্শ করতে লাগলেন, অজ্ঞাতবাসের বছরটা কোথায় কাটানো যায়। জঙ্গলে আর থাকা যাবে না, দুর্যোধনের দলবল ঠিক খুঁজে বের করে ফেলবে। কোনও নগরে গিয়ে অনেক লোকের মধ্যে মিশে থাকতে হবে। বেশ কয়েকটি রাজ্যের কথা আলোচনা করার পর যুধিষ্ঠির বললেন, “মৎস্যদেশটাই আমার পছন্দ। সে দেশের রাজা বিরাট ধার্মিক ও বৃদ্ধ, তাঁর অধীনে আমরা পরিচয় গোপন করে নিরাপদে থাকতে পারব।”

সেখানে কে, কী কাজ করবেন?

যুধিষ্ঠির বললেন, “আমি জানি, বিরাট রাজা পাশা খেলতে

বিরাট রাজার সভায় এসে এঁরা যেরকম কাজ চেয়েছেন, পেয়ে গিয়েছেন সহজেই। যাঁরা ইচ্ছে করলেই পৃথিবী জয় করতে পারেন, তাঁরা এসব সামান্য কাজ মেনে নিতে দ্বিধা করলেন না।

কিছুদিনের মধ্যে রাজা সকলের কাজ দেখেই খুশি হলেন, রানিও খুব ভালবাসলেন দ্রৌপদীকে। দ্রৌপদী মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তাঁর অমন গুণবান স্বামীদের এরকম দীন দশা দেখে। কবে শেষ হবে অজ্ঞাতবাসের এক বছর?

কয়েক মাস কেটে যাবার পর রাজধানীতে একটা উৎসব শুরু হল। অনেক দেশ থেকে মল্লযোদ্ধারা অর্থাৎ কুস্তিগিররা এল লড়াই দেখতে। তাদের মধ্যে একজনের নাম জীমূত, এই নামের মানে মেঘ। তার পাহাড়ের মতো চেহারা, মেঘেরই মতো গায়ের রং। সে সবাইকে লড়াই করার জন্য ডাকতে লাগল, কেউ ভয়ে আর কাছে এগোল না।

রাজা তখন ভীমকে ডেকে বললেন, “ওহে বল্লভ, তুমি লড়াই করো।”

অকারণে কারও সঙ্গে লড়াই করার একটুও ইচ্ছে নেই ভীমের। কিন্তু এখন চাকরি করছেন, রাজার আদেশ মানতেই হবে। তিনি সেখানে এসে দাঁড়াতেই জীমূত হিংস্র গর্জন করে উঠল। মাত্র একটুক্ষণের লড়াইয়েই ভীম তাঁকে এত জোরে তুলে আছাড় মারলেন যে, সে আর উঠতেই পারল না।

রাজা খুশি হয়ে ভীমকে অনেক উপহার দিলেন, তাও হাত পেতে নিতে হল ভীমকে।

যুধিষ্ঠিরকে রাজা এর মধ্যেই বেশ পছন্দ করে ফেলেছেন, প্রায় প্রতিদিনই দু’জনে পাশা খেলতে বসেন। অর্জুন, নকুল, সহদেবের কাজেও সবাই খুশি। এইভাবে কেটে গেল দশটা মাস, তার পরই একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল।

দ্রৌপদী প্রতি সন্ধ্যাবেলা রানি সুদেষ্ণার চুল বেঁধে তাঁকে নানান ভাবে সাজিয়ে দেন। একদিন সেখানে রানির ভাই এসে উপস্থিত। লোকটা মোটেই ভাল নয়। নানারকম অত্যাচার করে, কিন্তু সে রানির ভাই বলে কেউ তাকে কিছু বলতে সাহস পায় না। সে আবার রাজ্যের সেনাপতিও বটে। দ্রৌপদীর মতো এক অপরাধ সুন্দরীকে দেখে সে একেবারে মুগ্ধ। তক্ষুনি তাকে বিয়ে করতে চাইল। সে বলল, “তুমি কেন সামান্য পরিচারিকা হয়ে থাকবে, আমার বাড়িতে এসে তুমি কর্তৃত্ব নিয়ে থাকো।”

দ্রৌপদী জানালেন যে, তাঁর আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তাঁর স্বামী থাকেন বিদেশে। রানির ভাই কীচক সে কথা গ্রাহ্যই করল না। সে দিনের পর-দিন একই কথা বলে জোরাজুরি করতে লাগল। একদিন সে জোর করে দ্রৌপদীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই দ্রৌপদী তাকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে চলে এলেন রাজসভায়।

সেখানে যুধিষ্ঠির আর ভীমও তখন উপস্থিত। দ্রৌপদী তাঁদের কিছু জানাবার আগেই কীচকও চলে এল। এত লোকের সামনেই সে দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে লাথি মারল কয়েকবার। তারপর বেরিয়ে চলে গেল।

দ্রৌপদীকে এরকম ভাবে অপমানিত হতে দেখে ভীম রাগের চোটে দাঁতে দাঁত ঘষে উঠে দাঁড়াতে যেতেই যুধিষ্ঠির একটা আঙুলের খোঁচায় তাঁকে থামালেন। এই সময় ভীম কিছু করতে গেলেই তাঁদের পরিচয় জানাজানি হয়ে যেতে পারে। আর কৌরবরা যদি কোনও রকমে জেনে যায়, তা হলেই শর্ত অনুযায়ী তাঁদের আরও বারো বছর বনে-জঙ্গলে কাটাতে হবে। কাঁদতে-কাঁদতে দ্রৌপদী সবার কাছে সুবিচার চাইলেন। রাজা কিংবা অন্য কেউ কীচককে শাস্তি দেবার কোনও কথা বললেন না।

যুধিষ্ঠির বললেন, “সৈরিঙ্গী, তুমি এখন রানি সুদেষ্ণার কাছে আশ্রয় নাও। রাজসভায় কান্নাকাটি করা তোমায় মানায় না।”

দ্রৌপদী নিজের ঘরে এসে স্নান করলেন, তবু তাঁর অপমানের ব্যথা কিংবা রাগ কমল না। একসময় তাঁর মনে হল, একমাত্র ভীম ছাড়া আর কারও উপরই ভরসা করা যায় না। অর্জুন বৃহন্নলা হয়ে মেয়েমহলে নাচ-গান নিয়ে ব্যস্ত, নকুল-সহদেব ঘোড়া ও গোরুর পরিচর্যা করে যাচ্ছেন। আর যুধিষ্ঠির সব সময়ই দুর্বল, তাঁর দোষেই তো এত কিছু ঘটেছে।

তিনি সন্ধ্যার পর ভীমের ঘরে গিয়ে বললেন, “আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না, আমি আত্মঘাতী হব! কৌরবসভায় দুঃশাসন আমাকে দাসী বলেছিল, সে অপমান আমার মনে এখনও দগদগে হয়ে আছে। জয়দ্রথ একবার আমার চুল ধরে টেনেছিল, আর আজ কীচক এত লোকের সামনে আমাকে চুলের মুঠি ধরে লাথি মেরেছে। আমি দ্রুপদ রাজার মেয়ে, পাণ্ডবদের স্ত্রী, তবু আমাকে আর কত অপমান সহিতে হবে? বাড়ির ঝিয়ের মতো এখানকার সবার জন্য আমাকে খাটতে হয়, চন্দন বাটতে-বাটতে আমার হাতে কড়া পড়ে গিয়েছে...”

ভীমের চোখেও জল এসে গেল। তিনি বললেন, “ধিক আমার বাহুবল! ধিক অর্জুনের গাণ্ডীব। আজ সভার মধ্যে কীচকের কাণ্ড দেখে তখনই তার মাথাটা ভেঙে দেবার ইচ্ছে হয়েছিল আমার, কিন্তু বড় ভাই আমাকে নিষেধ করলেন। যাজ্ঞসেনী (দ্রৌপদীর আর-এক নাম), তুমি আর পনেরোটি দিন অপেক্ষা করো, তারপরই তোমার সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।”

দ্রৌপদী বললেন, “তোমরা থাকো তোমাদের অজ্ঞাতবাসের ভাবনা নিয়ে। কালকের মধ্যে কীচককে যদি কেউ চরম শাস্তি না দেয়, তা হলে আমি নিশ্চিত

মৃত্যুবরণ করবা।”

ভীম বললেন, “তা হলে শোনো। কীচককে আমি শাস্তি দেব ঠিকই, কিন্তু গোপনে। এখানে যে নৃত্যশালা আছে, সেটা সন্ধের পর ফাঁকা থাকে। বাতিও জ্বলে না। তুমি কীচককে খবর পাঠাও, তুমি তার জন্য কাল সন্ধের সময় সেখানে অপেক্ষা করবে। তারপর দেখো কী হয়।”

কীচককে খবর দিতে হল না, সকালে সে নিজেই এল দ্রৌপদীর কাছে। সদন্তে বলল, “আমি রাজসভায় রাজার সামনেই তোমাকে পদাঘাত করলাম, তবু কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করেছে কি? আমি সেনাপতি হলেও আসলে আমিই রাজা। এবার বুঝলে তো, আমাকে বিয়ে করা ছাড়া তোমার আর বাঁচার পথ নেই। আমার বাড়ি চলো, তুমি সেখানে মহাসুখে থাকবে।”

দ্রৌপদী বললেন, “অমি সব বুঝি। কিন্তু এখন তো আমি কাজে যাচ্ছি, আপনি সন্ধের পর নৃত্যশালায় আসুন, সেখানে সব কথা হবে। আর কেউ যেন সঙ্গে না আসে।”

কীচক মহানন্দে সেজেগুজে সন্ধেবেলা হাজির হল নৃত্যশালায়। গিয়ে দেখল অন্ধকারের মধ্যে কে যেন শুয়ে আছে। তাকে দ্রৌপদী মনে করে ছুঁতে গিয়েছে, অমনি উঠে বসলেন ভীম। তিনি বললেন, “পাপিষ্ঠ, আজই তোমার শেষ দিন।”

শুরু হল দু’জনের লড়াই। কীচকও বেশ বলশালী। বাহ্যুদ্বন্দ্বও জানে, কিন্তু ভীমের সঙ্গে এঁটে উঠবে, এমন সাধ্য কার আছে? একটুক্ষণের মধ্যে দু’ হাতে গলা চেপে ধরে

কীচককে তুলে ঘোরাতে লাগলেন ভীম। তাতেই কীচক শেষ। এর পরেও ভীমের রাগ মিটল না। তিনি কীচকের হাত-পা ভেঙে ঢুকিয়ে দিলেন তার শরীরের মধ্যে। এইভাবে কীচক বধ সমাপ্ত করে ভীম দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নিলেন।

এদিকে কৌরবরা চতুর্দিকে তন্নতন্ন করে খুঁজছিলেন পাণ্ডবদের। এই অজ্ঞাতবাসের মধ্যে তাঁদের সন্ধান পেলে তাঁদের আবার বনবাসে পাঠানো যাবে, কিন্তু কিছুতেই পাণ্ডবদের হৃদিশ তাঁরা পেলেন না। এর মধ্যে কীচকের মৃত্যুর খবরও ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্যোধন আর তাঁর সঙ্গীরা ঠিক করলেন যে, এই সময় মৎস্যরাজ্যটা অনায়াসেই জয় করে ফেলা যায়। বিরাট রাজা নিতান্ত বৃদ্ধ, তাঁদের রাজ্যে যুদ্ধ করার মতো তেমন বীর আর কেউ নেই।

কৌরবরা একদিন অতর্কিতে আক্রমণ করলেন মৎস্যরাজ্য। আর ঠিক সেদিনই পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের এক বছর পূর্ণ হয়ে গেল।

(এর পর ২০ অগস্ট সংখ্যায়)
ছবি: অনুপ রায়